নিউক্লিয় পদার্থবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন, বিজ্ঞানী হিসেবে তার ব্যাপ্তি দেশের সীমা অতিক্রম করেছে অনেক আগেই। তার মতো ব্যক্তিত্ব আমার মতো অখ্যাত লেখকের লেখা বইটি মন দিয়ে পড়েছেন, এটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, প্রশংসা করেছেন–এটি নিঃসন্দেহে আমার জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি।

আমার জানামতে আমার বইয়ের পরবর্তী রিভিউটি লেখেন ড. শহিদুল ইসলাম, দৈনিক সংবাদে। উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক। সমাজনীতি, রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেন। এ নিয়ে তার গোটা পাঁচেক বইও আছে বাজারে। সাম্প্রতিক সময়ে

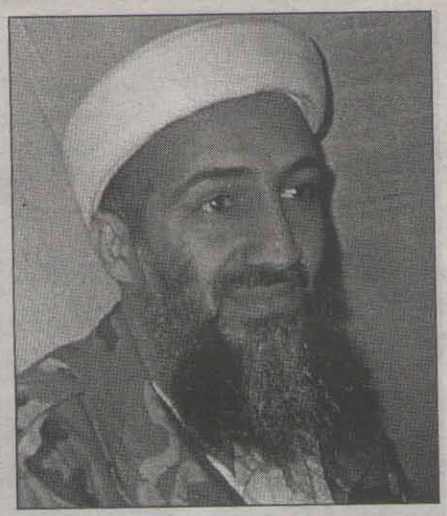

প্রকাশিত ড. ইসলামের 'বিজ্ঞানের দর্শন' বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মাত্র দু'জন বিজ্ঞানীকে (জে.ডি. বার্নাল এবং জর্জ সার্টন) নিয়ে আলোচনা করে বিজ্ঞানের ক্রম-ইতিহাস যে এত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা যায়, তা আমার এতোদিন জানা ছিল না। ইতিহাসবিমুখ সে সমস্ত 'প্রগতিশীলেরা' যারা ইসলাম ঠেকাতে গিয়ে অন্ধভাবে বুশ-ব্লেয়ারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য বইটি 'অবশ্য পাঠ্য' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ বইটি পড়লে তারা জানবেন উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বিজ্ঞানের এবং দর্শনের সমন্বয় করা কতটা জরুরি, আর জানবেন কীভাবে বিজ্ঞান 'মুষ্টিমেয় কতিপয় এলিট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়' একটা সময় শোষক শ্রেণীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হচ্ছে। ডঃ ইসলাম অনেক চিন্তা জাগানোর মতো উদাহরণ হাজির করেছেন তার বইয়ে। যেমন, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

'প্রকৌশল বা প্রযুক্তি থেকে বিজ্ঞানের জন্ম হলেও তার সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা মূল পার্থক্য আছে। তা হলো বিজ্ঞান বরাবরই শিক্ষিত মানুষের কর্মকাণ্ড। আজও। কিন্তু প্রকৌশল তা নয়। প্রাযুক্তিক বা প্রকৌশলী ঐতিহ্য বংশানুক্রমিকভাবে পরিবাহিত হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মে। কিন্তু বিজ্ঞান তা নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন একটি ব্যাপার যা বইপত্রের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। তাই শুরু থেকেই বিজ্ঞান একটি এলিট শ্রেণীর বিষয়ে পরিণত হয়। উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা শাসকশ্রেণীর সেবাপ্রদানকারী একদল গুণী মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ক্ষুদ্রতা বা সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানের চরিত্রের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে'।[১]

আবার কখনও বলেছেন :

একটা সময় সাধারণ মানুষ দার্শনিকদের শত্রু বলে বিবেচনা করতো। কেননা তাদের সাথে ঘৃণিত রোম সাম্রাজ্যের শোষকশ্রেণীভুক্ত উঁচু শ্রেণীর সখ্যতা কোনও রাখ-ঢাকের ব্যাপার ছিল না। তাই সাধারণ মানুষ কখনও নীরবে, কখনও বা হিংস্রভাবে দার্শনিকদের বিরোধিতা করতো। ... এমনকি শিল্প-বিপ্লবের যুগে মেশিন-ভাঙা দলের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম ঘটার পরও জনরোষ কীভাবে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল।[২]

সাধারণ মানুষের সাথে গ্রীক দার্শনিকদের বিরোধটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ড. শহিদুল ইসলাম :

গ্রীসের তিন প্রধান দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল এথেন্সের সন্তান হলেও সে এথেন্স অবক্ষয়ী এথেন্স। প্রায় আড়াই হাজার বছর এরা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে আসছে। এদের ক্ষমতার কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। মানব ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন নগরের বৈপ্লবিক মহত্ত্ব থেকে তারা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার প্রচণ্ড ক্ষমতা ও সামর্থ্য লাভ করলেও সে ক্ষমতাকে তারা প্রতিবিপ্লবের স্বার্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। প্লেটো কর্তৃক চিত্রিত সক্রেটিস, প্লেটো নিজে এবং অ্যারিস্টটল প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের ভয়ে ভীত হয়ে সবসময় গণতন্ত্রের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতেন। পৃথিবী যেন কখনও বদলাতে না পারে-অন্তত গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে প্লেটো অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[৩]

এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে কিন্তু বোঝা যায় যে, ইসলামি সভ্যতার 'আগ্রাসনের' ফলে যে উদ্ভূত পরিস্থিতি তা গ্রীক বা রোমীয় সভ্যতা থেকে কোনও অংশেই ব্যতিক্রম নয়। গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মতোই সাধারণ মানুষদের কাছে মুসলিম বিজ্ঞানীরা 'শাসকশ্রেণীভুক্ত' হিসেবে বিবেচিত হতো, তারা ভাবতো ওই সব পণ্ডিত উপদেষ্টারা নিশ্চয়ই কোনও কুমতলব আঁটছে। তাই সে সময়ও বিজ্ঞানীরা সহজেই ধর্মান্ধ উন্মত্ততার শিকার হতেন। স্থানীয় রাজবংশের পতন বা অভ্যুত্থানের সাথেও তাদের ভাগ্য জড়িত ছিল। তাই দেখা যায়, সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ইবনে সিনাও কোনও সুনিশ্চিত আশ্রয় পাননি। হমদানে বিদ্রোহীরা তার শিরোচ্ছেদের দাবি জানালে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। শেষ মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খলদুনেরও প্রায় একই অবস্থা হয়। কেন প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের সাধারণ মানুষ সন্দেহের চোখে দেখত, তাদের আক্রমণ করতো তা বুঝতে হলে সে সমস্ত বিজ্ঞানীদের শ্রেণী, অবস্থান, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, শাসক-শোষিতের সম্পর্কটুকু বুঝতে হবে, শুধু কোরান আর হাদিসের মধ্যে 'ভায়োলেন্ট ভার্সের' সন্ধান করলেই চলবে না। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিও বোঝা চাই। গ্রীক সভ্যতায় সক্রেটিসের হাতে বিষের পাত্র তুলে দিয়ে হত্যা, কিংবা ইসলামী সভ্যতার যুগে আল কিন্দি, আল রাজি বা ইবনে সিনার উপর অত্যাচার কোনওটিই 'ধর্মগ্রন্থ কর্তৃক ভায়োলেন্সের' কারণে ঘটেনি, এগুলোর কারণ পুরোটাই রাজনৈতিক আর সামাজিক। খ্রিস্টধর্মের ভায়োলেন্সগুলোর অনেকগুলোই ধর্মগ্রন্থের কারণে যতটা না ঘটেছে তার চেয়ে বেশি ঘটেছে সামন্ততান্ত্রিক যুগে চার্চের শক্তিমত্তা আর চার্চ কর্তৃক নির্ধারিত এবং আরোপিত ধর্মমতের কারণে। ব্যাপারটা উপেক্ষা করলে চলবে না। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে, ধর্মগ্রন্থের উপর বিশ্বাসের কারণেও 'ভায়োলেন্স' ঘটেছে, প্রবলভাবেই ঘটেছে।[৪] সামাজিক আর রাজনৈতিক কারণের বাইরেও ইসলামী যুগে খাঁটি দর্শন চর্চাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো তার একটা বড় কারণ ছিল দর্শন ও যুক্তির সাথে